BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY
RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)
(Open Access Peer-Reviewed International Journal)
DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03090018
Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 09| September 2025| e-ISSN: 2584-1890

# ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর : অশ্লীলতার অভিযোগ

**সঞ্চিতা মিত্র**

Research Scholar, Department of Bengali, RKDF University, Ranchi

## Abstract:

*সাহিত্যে রুচি, নীতি বা শ্লীলতা-অশ্লীলতার কোনো চিরস্থায়ী বা নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। এই ধারণাগুলির সীমারেখা খুবই অস্পষ্ট এবং দেশ, কাল ও যুগের রুচি পরিবর্তনের সাথে সাথে এগুলির মূল্যায়নও পরিবর্তিত হয়। আজ যা কুরুচিপূর্ণ বা অশ্লীল বলে বিবেচিত, ভবিষ্যতে তাই শ্লীলতার মর্যাদা পেতে পারে।ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল তিনটি ভাগের মধ্যে দ্বিতীয়ভাগ হল কালিকামঙ্গল। এর আখ্যান আদিরসাত্মক এবং সেটা নিয়েই তাঁকে অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন নানা সমালোচক থেকে সনামধন্য সাহিত্যিক। যদিও ভারতচন্দ্র শুধুমাত্র যৌনতার বর্ণনা এতে দেননি, আলংকারিক প্রয়োগও সমান ভাবে ঘটিয়েছেন, ভাষার চমৎকারিত্ব দিয়ে অশ্লীলতাকে ঢেকেছেন, প্রেম ও যৌনতা সম্পর্কে সামাজিক ট্যাবু ভাঙতে চেয়েছেন। কাহিনীর মধ্যে নাট্যগুন ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োগে তিনি যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছেন।ভারতচন্দ্রের কলংক ও সাফল্য উভয়েরই সাক্ষী এই বিদ্যাসুন্দর কাব্য।*

Keywords: *ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, অশ্লীলতা।*

## Introduction:

সাহিত্যে সুরুচি-কুরুচি, সুনীতি-কুনীতি, শ্লীল-অশ্লীল ইত্যাদির কোনো সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই। তার সীমারেখাও অত্যন্ত ঝাপসা; দেশকাল, যুগরুচির সঙ্গে দ্রুত তার মূল্যায়ণও বদলে যায়। আজ যা অশ্লীল কাল তা অনায়াসেই শ্লীলতার শিরোপা পায়। অষ্টাদশ শতকের অনেক মূল্যবোধ যেমন উনিশ শতকের চোখে আমূল বদলে যেতে পারে। এর অনেকটাই দেখার দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন। তবে আমাদের সাহিত্যে জয়দেবের ‘গীতগোন্দি’, বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ ইত্যাদির মতো কাব্য থাকলেও শ্লীলতা-অশ্লীলতা নিয়ে নৈতিকতার আদালতে মামলা-মোকদ্দমার বাড়বাড়ন্ত লক্ষ্য করা যায় প্রধানত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। এর পশ্চাতে সক্রিয় ছিল বলা যায়, উনিশ শতকীয় ইংরেজি সাহিত্যের ‘ভিক্টোরীয় যুগ’ (Victorian Age)-এর প্রভাব। নারীদের পোশাক-আশাক, হাবভাব, চলন-বলন, ভাবভঙ্গি ইত্যাদি সম্পর্কে যে তীব্র রক্ষণশীলতা এ যুগের ভাবাকাশকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল, ক্রমে সাহিত্য সমালোচকদেরও তা সংক্রামিত করে। আবার বিশ শতকীয় সমালোচকরা ক্রমে সেই রুগ্ন সমালোচনার ধারাগুলিকে বর্জন করেছেন। অর্থাৎ বলা যায় নীতি নৈতিকতা বিষয়ে কোনো অক্ষয় বিধান কোনো কালেই ছিল না; যুগ থেকে যুগান্তরে তার নতুন মাপকাঠি গড়ে ওঠে। সমালোচকের ভাষায়—

“রস-বিচারের ভাল-মন্দ ধারণা প্রধানত রুচিগত; সনীতি-দুর্নীতির সামাজিক বিচার আলাদা কিন্তু সাহিত্যে সুরুচি-কুরুচি ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত; এরপর আছে প্রচলিত আইনমত শালিনতার সীমানা নির্দেশ। রুচি, নীতি এবং দন্ডবিধি এই তিনটির কোনটাই একেবারে ছাড়াছাড়ি নয়, আবার কোনটাই অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক বা ঐশ্বরিক বিধান নয়। সাহিত্য রুচি, সামাজিক নীতিবিচার এবং আইনের বিধিনিষেধ সবই বদলায়।”[১]

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’কাব্যটি যে তিনটি অংশে বিভক্ত, তার মধ্যমটি হল বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গল।কাব্যের প্রথম ও তৃতীয়অংশের আরাধ্যা দেবী অন্নদা, আর এই দ্বিতীয়ভাগে দেবী কালিকা। বিদ্যাসুন্দরের আখ্যান অব্যবহিতভাবে মূল শিরোনামাঙ্কিত দেবীর মঙ্গলগানের সঙ্গে যুক্ত নয়, একে প্রক্ষেপ বলা যায়। মূলকাব্যের কাহিনী পরম্পরায় এটি অনিবার্যও নয়, আবার এর আভ্যন্তরীণ ভারটাও পৃথক।সেক্ষেত্রে, প্রক্ষেপকে যুক্ত করে শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য নানান কাব্যিক কলাকৌশলের সাহায্য যেমন নিতে হয়েছে রাজসভার কবিকে, তেমনই শ্রুতিমধুর ও নান্দনিক উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও সমান যত্নবান থাকতে হয়েছে তাঁকে চাকরি রক্ষার তাগিদে। এই বিদ্যাসুন্দরকথা মূলত প্রণয়লীলাত্মক। দেবী কালিকার প্রসঙ্গ তাই শুরু থেকে অনুপস্থিত, পরে সংযোজিত হয়েছে।যুগসন্ধিক্ষণের কবি ভারতচন্দ্রের ভারতচন্দ্রত্ব এই বিদ্যাসুন্দর অংশটি রচনার জন্যেই। সমগ্র অলংকৃত কবিজীবনে তিনি যে রাজকণ্ঠের মণিমালাটি গেঁথেছিলেন, সে মালার মধ্যমণি হল বিদ্যাসুন্দর, যা নিঃসন্দেহে তাঁর কালাতিক্রমী জনপ্রিয়তার, সমালোচনার, কলঙ্কের এবং সাফল্যের মূল স্মারক। আমাদের বর্তমান আলোচনাটিএই বিতর্কিত বিষয়টি নিয়েই।

Discussion:

বিদ্যাসুন্দর আখ্যানের মূলক্রমটি হল মোটামুটিভাবে এইরকম: যুবরাজ-রাজকন্যা >গোপন প্রেম >রাজকন্যা অন্তঃসত্ত্বা >প্রথমে রাজার কোপ >মৃত্যুদণ্ড >দণ্ডমুকুব>বিবাহ। এখন প্রশ্ন, বিদ্যাসুন্দর আখ্যানের এমন মোটিফ ভারতচন্দ্র কোথায় পেলেন। জ্ঞানের আদান-প্রদান থেকে প্রেম - সংস্কৃত সাহিত্যে, বৌদ্ধ পরম্পরায় এই বিষয়ক একটি লোককাহিনীর সন্ধান মেলে, তা প্রায় ২০০০ বছরের পুরোনো,উদয়ন-বাসবদত্তার কাহিনী। খ্রিস্টীয় ১ম থেকে ৩য় শতকের মধ্যে এই মিথ নিয়েই ভাসের নাটক ‘স্বপ্নবাসবদত্ত’। আবার খ্রিস্টীয় ৪র্থ শতকে রচিত কালিদাসের ‘মেঘদূত’ কাব্যে অবন্তী নামে এক গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়; যাঁরা সেখানে থাকেন, তাঁরা ‘উদয়নকথাকোবিদ’ বলে খ্যাত। এছাড়াও, বিদ্যাসুন্দর আখ্যানের অন্যান্য উপাদানগুলি হল- সোমদেবভট্টের ‘কথাসরিৎসাগর’ (খ্রিস্টীয় ১০ম শতক) এবং কাশ্মীরী কবি বিলহনরচিত ‘চৌরপঞ্চাশিকা’, ‘চৌরীসুরতপঞ্চাশিকা’, ‘চৌরপঞ্চাশৎ’ (খ্রিস্টীয় ১১দশ শতক)।

বিলহনের কাব্যটি মূলত ৫০ টি শ্লোকে রচিত, মৃত্যুর প্রাকমুহূর্তে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতের স্মৃতিচারণ। বিলহন সম্পর্কে জনশ্রুতি, তিনি নিজে এবং রাজকন্যার প্রেমে পড়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং নাকি এই কাব্য উচ্চারণ করেই নিস্তারলাভ করেন। সে যাই হোক, ‘চৌরাসুরতপঞ্চাশিকা’র মূল বিষয়বস্তু ছিলো– চৌর অর্থে চতুর, সুরত অর্থে মিলন; অর্থাৎ সংক্ষেপে চাতুর্যের দ্বারা মিলন।বিলহনের এ কাব্য নানান ভাষায় পল্লবিত হল। দক্ষিণ ভারতে এসে কাহিনী অনেক বদলালো এবং তাতে শ্লোকের সংখ্যাও বহুগুণ বেড়ে গেলো। তার দু’টি ভাগ— ‘পূর্বপীঠিকা’ ও ‘উত্তরপীঠিকা’। পূর্বপীঠিকায় এলো একটা গল্প- রাজকন্যা ও যুবরাজের প্রেম, গোপন মিলন; আর উত্তরপীঠিকায় থাকলো - রাজার কোপ, বধ্যভূমিতে পণ্ডিত যুবরাজের স্মৃতিচারণ। উদয়নকথায় সুরশিক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রেমের প্রসঙ্গটি ছিলো, কিন্তু মৃত্যুর প্রসঙ্গ ছিলো না । এভাবেই উদয়ন-বাসবদত্তা আর চৌরপঞ্চাশিকার গল্প মিলেমিশে জন্ম নিলো বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী।পূর্বভারতে যখন এলো, তখন আরও চমৎকার সংযোজন ঘটলো এ কাহিনীর। এই অসাধারণ প্রাকৃত প্রণয়কথা ১৫-১৬ শতকে হয়ে গেলো দেবমাহাত্ম্যমূলক।’কালিকামঙ্গল’ কাব্য বধ্যভূমিতে দৈবীকৃপায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত যুবরাজের শাস্তিমুকুর হচ্ছে এবং সসম্মানে রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ হচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিদ্যসুন্দরের

আদ্যন্ত প্রণয়লীলায় দেবী কালিকার কোনো ভূমিকা নেই, যুগের প্রভাবে তা নিছকই কাহিনীর শেষাংশে আরোপিত। মজার বিষয়, বাংলা আখ্যানে এই কাহিনীর মোট তিনটি পরিবর্তন ঘটলো—

১। গল্পে চরিত্রেরনাম বদলে গেলো। 'চৌরপঞ্চাশিকা'র প্রথম শ্লোকে ছিলো - "বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব" অর্থাৎ মোহাচ্ছান্ন বিদ্যা।শ্লোকাংশটি থেকে ধরে নেওয়া হল গল্পের নায়িকার নাম বিদ্যা। বাংলায় সমস্ত কাব্যগুলিতে তাই রাজকন্যার এই নামই বহাল থাকলো। বধ্যভূমিতে 'বিদ্যা' উচ্চারণে সুন্দরের বিলাপ প্রকৃতপক্ষে মহাবিদ্যা কালিকার আবাহন।

২। সংযোজিত হল দেবী কালিকার প্রসঙ্গটি। আগেই বলেছি, বিদ্যাসুন্দরের আদ্যন্ত প্রণয়লীলায় চরিত্রটি নিতান্তই গুরত্বহীন।

৩। 'চৌরপঞ্চাশিকা'র 'চৌর' শব্দটির অর্থটি ছিলোচাতুর্য। বাংলা গল্পে শব্দটির নতুন অর্থ দাঁড়ালো চৌর্য বা চুরি। সব মিলিয়ে সৃষ্টি হল এক জমজমাট প্রেমের গল্প।

উজ্জ্বল ও বর্ণময় সংস্কৃত সাহিত্য ভান্ডারেও রয়েছে আদিরসের মুখর আয়োজন। নরনারীর কাম, যৌনমিলন বা নারীদেহ বর্ণনায় তারা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বহুক্ষেত্রেই সংকোচহীন, নির্দিধ। কারণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আহার-পানীয় ইত্যাদির মতো মানুষের কামপ্রবৃত্তিকেও তারা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও প্রকৃতি নির্ধারিতই মনে করতেন। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের মতে, কামভাবের স্থায়ী রস হল আদিরস, আর দেহকে অবলম্বন করেই ঘটে তার উদ্ভব। তাই দেহজ লীলা বা দেহকেন্দ্রিক বিষয়ের বর্ণনায় তারা কখনো পিছপা হননি। তবে দেহকে অবলম্বন করে তারা প্রায়ই দেহাতীতে পৌঁছে যেতেন। দেহাতীতের সেই অনন্ত রসলোকে তখন আর আলাদা করে শ্রীল-অশ্লীলের কোনো স্বতন্ত্র মূল্য থাকত না. সব একাকার হয়ে যেত। আর এভাবেই তারা পাঠকের সামনে তুলে ধরতেন অনাবিল আনন্দ ও সৌন্দর্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার। অন্তিম বিচারে তা কোনোভোবেই পাঠকের লজ্জা-ঘৃণার উদ্রেক করতো না, সৃষ্টিকেও করে তুলতো না অশ্লীল। অন্যভাবে বলা যায়, অশ্লীল (= যা শ্রীযুক্ত নয়) বা অশ্লীলতাকে তারা কার্যদোষ হিসাবেই দেখতেন। 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থের প্রণেতা বিশ্বনাথ কবিরাজ-এর ভাষায়, সভ্য বক্তার অনভিপ্রেত বা অসভ্য সমাজে প্রচলিত কুৎসিত অর্থের প্রকাশকেই 'অশ্লীলতা' বলে।এখন প্রশ্ন হল- ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ওপর অশ্লীলতার অভিযোগ উঠলো কেন? উনিশ ও বিশ শতকের ভারতচন্দ্র সমালোচকরা বিদ্যাসুন্দর অশ্লীল কিনা - এই বিতর্কে স্পষ্টতই দু'টি পৃথক শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছেন।বিদ্যাসুন্দর এর গল্পটি মোটের ওপর একটি নিষিদ্ধ প্রেমের গল্প। অশ্লীলতার বিষয়ে আলোচনার শুরুতেই লক্ষ্য করলে দেখা যায়—

প্রথমত, গল্পের কাঠামোতে যৌন মিলনের প্রসঙ্গ আছে মোট ৫ টি পরিচ্ছেদে-বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভ, বিহার, বিপরীত বিহারারম্ভ, বিপরীত বিহার এবংদিবাবিহার ও মানভঙ্গ। এই পাঁচটি অংশ আদিরসাত্মক। কিন্তু এই আদিরস রগরগে আদিরস নয়। বিহার ও বিপরীত বিহারম্ভের মাঝে 'সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা'র অংশ রয়েছে, যেখানে হাস্যরসের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। আবার বিপরীত বিহার ও দিবাবিহার বর্ণনার মাঝে রয়েছে 'সুন্দরের সন্ন্যাসীবেশে রাজদর্শন'ও 'বিদ্যাসহ সুন্দরের রহস্য'। এই টানা না বলার কৌশলই বুঝিয়ে দেয় ভারতচন্দ্র আগাগোড়া রগরগে আদিরসের বর্ণনা দিতে চান নি; বরং তা তিনি বারবার ভেঙে দিয়েছেন একটি নিরীহ কৌতুকের পরিচ্ছেদ দিয়ে।

দ্বিতীয়ত, বিহারের অংশগুলিতে শ্বাসাঘাত প্রধান ক্ষিপ্রছন্দের ব্যবহার লক্ষ্য করার মতো। যেমন— সংস্কৃত শ্বাসাঘাত প্রবল 'তোটক' ছন্দের মেজাজটা তিনি যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করেছেন বিদ্যসুন্দরের দেহসম্ভোগ বর্ণনায়—

> "কুচশম্ভুশিরে নখচন্দ্রকলা।
>
> বড় শোভিল ছাড়ই ঠাট ছলা॥

কুচহেমঘটে নখরক্তছটা।

বলিহারি সুরঙ্গ প্রবালঘটা॥” (বিহারারম্ভ)[২]

তৃতীয়ত, চরম যৌনমিলনের বর্ণনাতে ভারতচন্দ্র অসামান্য সাবলীল ও তুখোড়। কখনোও কোমল আলতো ধ্বনির স্নিগ্ধ দোলায় এমন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন,যাতে পড়তে গেলে ধ্বনির তরঙ্গে ভেসে বক্তব্যকে না শুনে এগিয়ে চলার সম্ভাবনা তৈরি হয় পাঠক-শ্রোতার মনে। কখনোও বা আবার ধ্বন্যাত্মক শব্দের বাহুল্যে তিনি আদিরসের বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তুলেছেন।অন্যদিকে ধ্বনিঝংকারের তরঙ্গের মাধ্যমে বিষয়টি যাতে শ্রোতাদের কানেতীব্র উত্তেজনা না জাগায়, তাই তাকে আড়াল করার ব্যাপারেও সমান সচেতন থেকেছেন—

“দুহ তনু ঝম্পন কম্পন ঘন ঘন

উথলিল মদনতরঙ্গে।” (বিহার)[৩]

চতুর্থত, অলংকারের ব্যবহারটিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থালংকারের ব্যবহারে বিপরীত বিহার-দৃশ্যের অশীলতাকে সযত্নে আচ্ছন্ন করেছেন তিনি—

“রায় বলে আমি করী তুমি কমলিনীশ্বরী

বান্ধহ মৃণালভূজপাশে।

আমি চাঁদ পড়ি ভূমি ফুল কুমুদিনী তুমি

উঠ মোর হৃদয়-আকাশে॥” (বিপরীত বিহারারম্ভ)[৪]

আবার কখনোও শব্দালংকারের চমৎকারিত্ব আচ্ছাদন করে থাকে আদিরস—

“চুম্বন চুচুকৃতি শীৎকৃতি শিহরণ

কোকিল কুহরে গলায়ে” (বিহার)[৫]

অথবা,

“ঘন অবিলম্ব নিতম্ব দোলে।

ঘুন ঘুনু ঘন ঘুঘুর বোলে॥” (বিপরীত বিহার)[৬]

প্রসঙ্গত বলা যায়, ভারতচন্দ্র এখানে দু’টি ঔচিত্য লঙ্ঘন করলেন সতর্কভাবে—

(ক) কামশাস্ত্রের যৌনমিলনে নারীর সক্রিয়তার ধারণা থাকলেও, বাংলা সাহিত্যে তার ব্যবহার ছিলো না। পুরুষতন্ত্রের এই ট্যাবুকবিভেঙেছেন।

(খ) বিপরীত রতিতে নারীর অধিক সক্রিয়তা সমাজনিষিদ্ধ ছিলো। ভারতচন্দ্র তা অতিক্রম করে গেলেন।আমরা দেখলাম, ভারতচন্দ্র কতটা সচেতনভাবে অশ্লীলতাকে ভাষার চারুত্ব, অলংকারের চমৎকারিত্ব আর ছন্দের মনোহারিত্বে আবৃত করেছেন।

‘কাব্যে অশ্লীলতা– আলংকারিক মত’ নিবন্ধে প্রমথ চৌধুরি অশ্লীলতা কী?-এই বিষয়ে আলোচনাসূত্রে বলেছেন- প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিক বামনাচার্যেরমতানুযায়ী, অশ্লীলতা হলযা ‘ব্রীড়াজুগুপ্সামঙ্গলাতঙ্কদায়ী’। অর্থাৎ, যা ব্রীড়া, জুগুপ্সা, অমঙ্গলও আতঙ্ক সৃষ্টিকারী, তাই হল অশ্লীল।ভারতচন্দ্র কিন্তু এই ব্রীড়া জাগান না। তিনি নিজেই ‘বিহার’ অংশের শেষে ভণিতায় বলছেন—

“সহচরীগণ যদি সন্নিধি আইল
নমুখী অতি লাজে।
ভারতচন্দ্র কহে শুনলো সুন্দরি
লাজ করো কোন কাজে॥”[৭]

প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে, নরনারীর প্রত্যক্ষ যৌনমিলনকে শিল্প ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র এবং খাজুরাহোর ভাস্কর্য সে প্রমাণ বহন করে। সেখানে এই ব্রীড়া বা লজ্জার দৃষ্টি ছিলো না। ভারতচন্দ্রও এ বিষয়ে সমমনস্ক, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীন ঐতিহ্যই তিনি মানলেন। প্রাকৃবিবাহমিলন অমঙ্গলদায়ী —এমন অভিযোগ উঠতেই পারে। কিন্তু ভারতচন্দ্র দেহমিলনের পূর্বেই বিবাহের মধ্যে দিয়ে তাকে মাঙ্গল্যে ভূষিতকরেছেন ‘বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভ’-এর সূচনায়—

“বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার।
গান্ধর্ব্ববিবাহ হৈল মনে আঁখি ঠার॥
কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর।
পুরোহিত ভট্টাচার্য হৈল পঞ্চশর॥”[৮]

ফলে, প্রকৃতপক্ষে এ বিহার প্রাক-বিবাহ নয়। সুতরাং সে অর্থে কোনো জুগুপ্সা বা গোপনীয়তাও নেই। আর যেহেতু অমঙ্গল ও জুগুপ্সা নেই,তাইআতঙ্কও নেই।

প্রমথ চৌধুরি ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার মধ্যে এই art -কেই চিহ্নিত করেছেন—

“The Vidyasundar is a love story, a novel in verse. But the love he treats of has nothing spiritual or ideal about it, butis the common mundane passion which lends itself to humorous, and even indelicate treatment..Bharatchandra’s poem, if I may say so, is a study in nude-not of Psyche, but of Venus Pandemos.”[৯]

—ভারতচন্দ্রের এই অনাবৃতি’ন্যুড’ ভাস্কর্যের মতো। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘সাহিত্যধর্ম’ প্রবন্ধে বলেছিলেন— ‘সুবৃহৎ অনাবরণের মধ্যে অশ্লীলতা নাই’ —ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর আসলে তাই। রঙ্গলাল বা মধুসুদনও ভারতচন্দ্রকে সমর্থন জানিয়েছেন। রমেশচন্দ্র দত্ত এ বিষয়ে সপ্রশংস ছিলেন।এমনকি রবীন্দ্রনাথও ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেন নি। ভারতচন্দ্রের রচনাসমূহের অন্যতম সম্পাদক মদনমোহন গোস্বামী এ বিষয়ে বলেছেন—

“বিদ্যাসুন্দর সৌন্দর্যময় (A thing of beauty) এবং সেইজন্যই ইহা চিরানন্দদায়ী (A joy for ever)।এই সৌন্দর্যের অভাবেই রামপ্রসাদের ‘বিদ্যাসুন্দর’ কালজয়ী হইতে পারে নাই। ভারতচন্দ্রের কাব্যের ‘উজ্জ্বলরস’ আবিল হইলেও উজ্জ্বল। যে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অধোগতির চিত্র ইহার মধ্যে লক্ষিত হয় তাহা অষ্টাদশ শতকের আকস্মিক সৃষ্টি নহে।”[১০]

বিদ্যাসুন্দর প্রণয়কথা আদিরসাত্মক।একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যে (যেমন- কুমারসম্ভব, গীতগোবিন্দ ইত্যাদি) আদিরসাত্মক কাহিনীতে দেহমিলনের বর্ণনা স্বীকৃত। কিন্তু উনিশ শতকের বিদ্যাসুন্দর চর্চায় বাঙালি সমালোচকের একটা বৃহত্তর অংশ ভারতচন্দ্রকে কাঠগোড়ায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। উনিশ শতকীয় পরিমণ্ডলে অশ্লীলতা সম্পর্কে জন্ম নিয়েছিল এক নতুন দৃষ্টিকোন। এই রক্ষণশীলতাকে যদিও কেউ কেউবলেছেন ‘middle class mentality’, কিন্তু একথা পুরোপুরি সত্য নয়।এই জনমানস ছিল অনেকটাই ভিক্টোরীয় নৈতিকতায় আচ্ছন্ন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র মনে করছেন ভারতচন্দ্র খারাপ কবি, হীরামালিনী চরিত্র ছাড়া উল্লেখ করার মতো কিছুই নেই—

“His works are disfigured, too, by a disgusting obscenity which unfits them for publication at a time whenBengali readers are not all the rougher sex.”[১১]

‘বিরক্তিকর অশালীনতা’র বিরুদ্ধে এই বঙ্কিমী ক্ষোভ যা সেই সময়ে সম্প্রসারিত হয়েছিল হেমচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত, তাকেশুধুমাত্র সমকালীন মানসিকতা বলে বিবেচনা করলে ভুল হবে। তবে উনিশ শতকে এর বিরূপ সমালোচনাও ছিল। উনিশ শতকের নব্বই এর দশকেদাঁড়িয়ে অশ্লীলতার প্রশ্নে ভারতচন্দ্রের পক্ষ নিয়েছিলেন গৌরদাস বৈরাগীর মতো মানুষ। অবশ্য এই সপক্ষতার দৃষ্টান্ত উনিশ শতকে প্রায় দুর্লভ।সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারতচন্দ্র তাঁর সমকালে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হন নি, এমনকি বর্তমান কালেও হন নি।শুধু উনিশ শতকে এক আধা-ঔপনিবেশিক মানসিকতার শিকার হয়েছিলেন তিনি।

এবার দেখা যাক, ভারতচন্দ্রের আধুনিক মননের অন্যান্য দিকগুলো। প্রথমেই লক্ষ্যণীয়, রাজার পৃষ্ঠপোষকতা করার কোনো দায় বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর বুনোটের ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র মানেন নি। প্রায় বিনা ভূমিকায় বিদ্যা ও সুন্দরের কথা আরম্ভ করছেন তিনি। মূল মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে এই আখ্যানটিকে জুড়ে দেবার পূর্বসূত্রটুকু লক্ষণীয়। কাব্যের প্রথমভাগে দেবী অন্নদার কৃপাধন্য ভবানন্দ মজুমদার এই অংশে বর্ধমানে এসে এই কাহিনী শোনেন এবং সুড়ঙ্গদর্শন করে এসে মানসিংহকে বিবরণ দিয়ে সব জানান। এই নিয়েই কাব্যের দ্বিতীয়ভাগ কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর। পুরো কাহিনীর মধ্যে একটি নাট্যগুণ আছে, সামাজিক বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ পেয়েছে। আবার ‘কোটাল কর্তৃক চোর ধরা’ অংশে থেকে গেছে ডিটেটিভ গল্পের রেশ। সুড়ঙ্গ আবিষ্কারের মাধ্যমে চোরধরার এই চিত্রাকর্ষক ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভারতচন্দ্রের মস্তিষ্কপ্রসূত।আবার তার সঙ্গে পরতে পরতে মিশিয়ে দিয়েছেন নির্মল হাস্যরস। ‘নারীগণের পতিনিন্দা’ অংশটিও মঙ্গলকাব্যের প্রথানুগত্য থেকে পৃথক। সুন্দরের রূপে মোহিত হ’য়ে পুরনারীরা নিজ স্বামীভাগ্যের নিন্দা করলেও বিষয়টিতে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো একঘেয়েমি নেই। এ কাব্যে পুরনারীদেরঅভিযোগ সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিন ভাগে বিভাজ্য—

(ক) যাদের স্বামী বিকৃত বিকলাঙ্গ, ফলে দাম্পত্যযাপন ব্যাহত হয়।

(খ) যাদের স্বামীরা রাজসরকারের চাকুরিজীবী, জীবিকার কারণে ব্যস্ত থাকার ফলে স্ত্রীকে যথাযথ সঙ্গ দিতে পারে না (রাজসভাকবিভারতচন্দ্র নিজেও এই শ্রেণিভুক্ত)

(গ) যারা হিন্দুসমাজের বহুবিবাহ নীতির ফলে নিষ্পেষিত।

তাছাড়া, অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো দেবদেবীর পূজা প্রচার ও মাহাত্ম্যবর্ণনের সীমাবদ্ধতা নেই এই কাহিনীতে। শুধু বন্দী অবস্থায় সুন্দর মশানে যে কালীস্তুতি করেছে তা একমাত্র দেববদনা। ৫০ অক্ষরে (১৬ স্বরবর্ণ, ৩৪ ব্যঞ্জনবর্ণ ) সুন্দরের চৌতিশাস্তব এবং তারপর সন্তুষ্ট কালিকার ভূতপ্রেতসহ আগমন ও কৃপা। ভারতচন্দ্রের বিরহবিধুরা নায়িকা বিদ্যার বারোমাস্যাটিও ভিন্নধর্মী। এই বারোমাস্যাটি গঠনগত দিক থেকে প্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে মঙ্গলকাব্যের প্যাটার্ন মানলেও, বিদ্যার যৌবনযাপন

বিষয়ক সুখের বারোমাস্যা। মূল কাব্যের প্রথম ও তৃতীয় অংশে আছে দুঃখ দারিদ্র্য; কিন্তু এই দ্বিতীয় অংশে দুটি অভিজাত নরনারীর প্রেমের ছবি চিত্রিত। তাই বারোমাস্যাটিও সুখের। এটাই রাজসভার কাব্যের মেজাজ। অভিজাত কবির মেজাজ— "...free aristocratic morality that prevailed up to the eighteenth century."[১২] সুতরাং বলা যেতে পারে, ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি হিসেবে এই অংশে তুলনামূলকভাবে অনেক স্বাধীন ছিলেন, তাই তাঁর প্রকৃতমেজাজটা ধরা পড়েছে এই খণ্ড রচনায়। অবশ্য অনেকে মনে করেন রাজসভার কৌতূহল আর আদিরস শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্যেই যদিভারতচন্দ্র এই অংশটি রচনা করে থাকেন, তাহলে তিনি কোথায় স্বাধীন ? আমাদের প্রতিযুক্তিটা সেক্ষেত্রে অন্য। ভারতচন্দ্র গ্রাম্য কবি নন, রামপ্রসাদের মতো অনভিজাত কবিও নন। তিনি ব্যক্তিক জীবনে অনেক দুঃখ-দারিদ্র্য সহ্য করেছেন বটে, কিন্তু তিনি অভিজাত পরিবারের সন্তান। কৃষ্ণনগর রাজসভার মেজাজটার সঙ্গে তাঁর নিজের মেজাজটা খাপ খায়। এই সমান্তরাল অভিজাত মানসিকতা তাঁর ছিলো, আর ছিলো সুশিক্ষিত, পরিমার্জিত, রুচিশীল অথচ সংস্কারশূন্য একটা মন। এই মন নিয়েই তিনি বিদ্যাসুন্দর লিখতে বসেছিলেন। শুধুমাত্র রাজার আজ্ঞায় অনিচ্ছাবশত এ কাব্যাংশ লিখলে তা এত উন্নতমানের রচনা হতো না। সৌন্দর্য স্পৃহাকবিরও ছিলোযথেষ্ট।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে যে, ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী বাংলা ও সংস্কৃত কবিরা কি খুব শ্লীল? রামপ্রসাদ অনেকের কাছে মহা সাধু কবি বলে গণ্য। গান-রচয়িতা রামপ্রসাদ নিষ্কলুষ কবি, কিন্তু 'বিদ্যাসুন্দর' রচয়িতা রামপ্রসাদও কি তাই? চন্ডীদাস মহাকবি, কিন্তু তাঁর রচিত কৃষ্ণকীর্তন কি বিদ্যাসুন্দরের চাইতেও সুরুচিসম্পন্ন? এ দুইয়ের ভিতর প্রভেদ এটুকুই যে, বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীলতা আবৃত ও কৃষ্ণকীর্তনের অনাবৃত? ভারতচন্দ্রের কাব্যের কলঙ্কমোচন আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কেননা তা করা অসম্ভব ও অনাবশ্যক। শুধুমাত্র জিজ্ঞাসা এই যে, যে দোষে প্রাচীন কবিরা প্রায় সকলেই সমান দোষী, সে দোষের জন্য একা ভারতন্দ্রকে তিরস্কার করবার কারণ কি?

এর প্রথম কারণ, ভারতচন্দ্রের কাব্য যত সুপরিচিত অপর কারও তত নয়। আর দ্বিতীয় কারণ, ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার ভিতর art আছে, অপরের আছে শুধু Nature। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আর এক প্রাজ্ঞ সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও মনে করেন ভারতচন্দ্রই একমাত্র কবি যিনি কামসম্ভোগকে পর্যন্ত কাব্য রমনীয় করে তুলতে পেরেছেন—

"তাঁহার কামকেলি বর্ণনা অক্ষম আক্ষরিকতার স্থূল অবলম্বন স্বীকার করে নাই; ইহা কটাক্ষ কৌতুকে, তির্যক ব্যঞ্জনায়, অব্যবহিত অর্থের অন্তরালশায়ী বিদগ্ধ জনবোধ্য চটুল ইঙ্গিতে পাঠকের মনকে সূক্ষ্মভাবে নাড়া দিয়াছে ও ইন্দ্রিয়লালসা ও বুদ্ধিবৃত্তির যুগপৎ তৃপ্তি সাধন করিয়াছে। ...জৈব সম্ভোগের এমন কাব্য রূপান্তরের দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে আর নাই, বিশ্বসাহিত্যেও খুব বেশি নাই।"[১৩]

সুতরাং, ভারতচন্দ্রের আগে বাংলা কাব্যধারায় অশ্লীলতা এসেছে প্রধানত প্রাকৃত জীবনের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে। ভারতচন্দ্রে এসেই তা প্রথম শিল্প সমুন্নতি পেল। ভাষার ঐশ্বর্যে, অলংকারের প্রাচুর্যে, শব্দের ঝংকারে, ভাবোপযোগী ছন্দের বৈভবে, কুহকমোহিনী বর্ণনায় প্রতি মুহূর্তে তা আমাদের চমৎকৃত করল। মঙ্গলকাব্য বিশেষজ্ঞ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ও মনে করেন—

"ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কবিগণ অশ্লীলতাকে প্রাকৃতজীবনের সহজাত বা Nature হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অশ্লীল বিষয়ও যে শিল্প-সৌষ্ঠবের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে, ভারতচন্দ্র তাহা অনুভব করিয়াছিলেন; সেই জন্য তাঁহার রচনার অশ্লীল স্থানগুলি ভাষার দীপ্তি ও রসের ঔজ্জ্বল্যে বিদগ্ধ মনের নিকট সার্থক আবেদন সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার যাবতীয় অলংকার, ভাষার চাতুর্য সবই এই অশ্লীল স্থানগুলির বর্ণনাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভাবাগত অশ্লীলতা বা গ্রাম্যতা ভারতচন্দ্রে একেবারেই নাই, তাঁহার মধ্যে যে অশ্লীলতা আছে তাহা ভাব বা অর্থগত অশ্লীলতা; কিন্তু তাহা অলঙ্কৃত কাব্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইবার ফলে

তাহারও প্রকাশভঙ্গির মধ্যে কোনও প্রত্যক্ষতা (directness) ছিল না। অশ্লীলতা যে সাহিত্যিক শিল্প সাধনার বিষয়, তাহা বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের রচনাতেই প্রথম বুঝিতে পারা গেল।”[১৪]

অধিকাংশ সমালোচকই একমত যে, ভারতচন্দ্রের কাব্যের অশ্লীলতার বীজ নিহিত ছিল দেশকালের গর্ভেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশ ছিল এক চূড়ান্ত অরাজক সময়। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭) পর মুঘল শক্তির হতমান অবস্থা, বিদেশি বণিকদের বাড়বাড়ন্ত, নব্য অভিজাত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ইত্যাদির ফলে বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশ রাজনৈতিক পাণ্ডুরতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। বর্গীর হানা, জলদস্যুদের উপদ্রব, স্থানীয় ভূস্বামীদের শোষণ, নিপীড়ণ, যথেচ্ছ শুল্কবৃদ্ধি ইত্যাদির কারণে মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়ল অন্নের হাহাকার। নিচুতলার দরিদ্র, হতভাগ্য মানুষদের কান্নার পাহাড়ের ওপর গড়ে উঠল অভিজাত শ্রেণির বিলাস বৈভবের রাজপ্রাসাদ। ভেঙে পড়ল মূল্যবোধের কাঠামো, রুচিবিকার ও ইন্দ্রিয় বিলাসিতায় ফাটল ধরলো সনাতন ধর্মীয় বেদিতে। বাহ্য আড়ম্বর ও অন্তঃসার শূন্যতায় আক্রান্ত হল সমগ্র নাগরিক জীবন। সভ্যতা-ভদ্রতা, সুরুচি, শিষ্টতা, আন্তরিকতার জায়গা দখল করলে শঠতা, প্রতারণা, মেকিতা। দরবারী জীবনকে কেন্দ্র করে চক্রবৃদ্ধিহারে বর্ধিত হল হানাহানি, খুন, ষড়যন্ত্র, গোপন মন্ত্রণা ইত্যাদি। ফলস্বরূপ জন্ম নিল এক পচনশীল সংস্কৃতি। সামগ্রিকভাবে, অন্যান্যদের মতোই সেই নষ্টনীড় সমাজের ভগ্নপতাকাই বহন করেছেন ভারতচন্দ্র—

“নরনারীর দেহমিলন বাংলা কাব্যে একটা দুর্লভ বস্তু নয় ঠিকই কিন্তু বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে তার যা চিত্র তা জীবনের সর্বব্যাপকতায় সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অপরিহার্য। অপরপক্ষে ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরের মিলনের যে চিত্র এঁকেছেন তার বাকভঙ্গিতে, তার বিপরীত বিহারে কি এক রিরংসার ভাব ফুটে ওঠেনি? শ্লীলতার বিচার না করেই বলা যায় যে, যৌন সম্বন্ধের এ চিত্র বাংলা কাব্য ধারায় ওতপ্রোতভাবে অনুসৃত হয়ে আসেনি। বর্তমান কাব্যে এ একেবারে অনিবার্য ছিল। এ প্রবৃত্তিটা যুগের। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে, দ্বিজ ভাবনীর অনুবাদ রামায়ণে, জীবন মৈত্রর মনসার ভাসানে এবং ও যুগের বহু বাংলা কাব্যে এর প্রমাণ স্পষ্ট তারই শিল্পকৌশলের চরম স্ফূর্তি পেয়েছে।”[১৫]

**Conclusion:**

পরিশেষে বলা যায়, এ কাব্যের প্রথমখণ্ড ‘অন্নদামঙ্গল’ বা ‘শিবায়ন’-এ ভারতচন্দ্র যেমন পৌরাণিক ঋণ মিটিয়েছেন, তৃতীয়খণ্ড ‘মানসিংহ-তে মিটিয়েছেন পৃষ্ঠপোষকের ঐতিহাসিক ঋণ, আর দ্বিতীয়খণ্ড ‘কালিকামঙ্গল’ বা ‘বিদ্যাসুন্দর’-এ সাহিত্যিক ঋণ। সারাজীবন ধরে বেশ কিছু রচনা সৃষ্টি করলেও, ভারতচন্দ্রের মূল কবিখ্যাতি অন্নদামঙ্গলকাব্য রচনার জন্যই। অথচ যে শিরোনামাঙ্কিত দেবীর মঙ্গলগান, সেই দেবী অন্নদার মাহাত্ম্যবর্ণন মূলকাব্যের প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডে থাকলেও, ত্রিধাবিভক্ত এই কাব্যে সাহিত্যিক দ্রোহটি নিষ্পন্ন হয়েছে মধ্যমাংশে জনপ্রিয়তা ও নিন্দার বিপ্রতীপ টানে। তাই বিদ্যাসুন্দর ঋদ্ধ একটি কাব্য। এই খন্ডরচনাতেই আমরা চিনতে পারি যুগসন্ধিক্ষণের কবির প্রকৃত স্বরূপকে, যেখানে তাঁর হাত ধরে বাংলা সাহিত্য মধ্যযুগীয় প্রথানুগত্যের প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে আধুনিকতার প্রথম সূর্যোদয় দেখেছিলো। প্রথম প্রভাতের আলোয় যেমন একটা শীতল অস্পষ্টতা জড়িয়ে থাকে, তেমনভাবে আধুনিকতার সূচনালগ্নেও উনিশ শতকীয় মূল্যবোধের নিক্তিতে সমালোচকদল তাঁকে যথাযথভাবে চিনতে পারেন নি। গতানুগতিকতার কষ্টিপাথরে যাচাই করতে গিয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তিকে করেছেন কালিমালিপ্ত। কিন্তু আমরা একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে মুক্তবুদ্ধি দিয়ে বিচার করে একথা সোচ্চারে স্বীকার করতে পারি যে – বিদ্যাসুন্দর যদি একান্তই ভারতচন্দ্রের কলঙ্করেখা হয়, তবে নিঃসন্দেহে সে কলঙ্ক হয়ে উঠেছে তাঁর সমগ্র কবিজীবনের অলংকার, অলংকৃত কলঙ্ক।

Reference:


১. আচার্য, সরোজ। (১৯৮৮)। সাহিত্যে শালীনতা, সরোজ আচার্য রচনাবলী, ২য় খন্ড, পার্ল পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা- ২০৯

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস, সজনীকান্ত (সম্পা.) (১৪১৯)।ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, অন্নদামঙ্গল ২য় খন্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃষ্ঠা- ৬৪

৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৬

৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৩

৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৬

৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৫

৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৬

৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬০

৯. চৌধুরী, প্রমথ। (২০১০)।প্রবন্ধ সংগ্রহ (অখণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা- ২১২

১০. গোস্বামী, মদনমোহন। (১৯৫৬)।ভারতচন্দ্র, পরিচয় পর্ব, সাহিত্য অকাদেমি, পৃষ্ঠা- ১৭

১১. Chattopadhyay, Bankim Chandra. (1871). Bengali Literature, Calcutta Review

১২. Ghosh, J.C. (1948). Bengali Literature, Oxford University Press, Nadia Period, p. 94

১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। (১৯৬৭)। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, ১ম খন্ড, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, পৃষ্ঠা- ১৭৬

১৪. ভট্টাচার্য, আশুতোষ। (১৯৭৫)। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জি এন্ড কোম্পানি প্রাঃ লিঃ, পৃষ্ঠা- ৮১১

১৫. গুপ্ত, ক্ষেত্র। (১৪০৩)। প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন, সাহিত্য আকাশ, পৃষ্ঠা- ১৪১



**Citation:** **মিত্র. স.,** (2025) "ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর : অশ্লীলতার অভিযোগ", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-09, September-2025.